OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 187 - 194
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনোত্তর নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব

নগেন মুর্মু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া, হুগলি
Email ID: nagenakna@gmail.com
0009-0008-2736-2534

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিধা দ্বন্দ, চরিত্রের পদস্খলন, দাম্পত্য বিপর্যয়।

Abstract

ছোটগল্পের মধ্যে নিত্যকালের বস্তুময় জীবন সুসংগত ও সুগভীরতায় প্রতিফলিত হয়। আমাদের সমাজে অবস্থিত পারিপার্শ্বিক মানুষজনের দেহ, মন ও আত্মার অনায়াস রূপ বাস্তবতার সাথে প্রতিফলিত হতে পারে ছোটগল্পের মধ্যে। মানুষের মন সমুদ্রের গভীরতার ও বিস্তীর্ণ মহাকাশের মত বিস্ময় রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ। মানুষকে নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা, বিস্ময় ও রহস্যময়তার অন্ত নেই। মনুষ্য জীবনের সেই বিচিত্র রূপের সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে স্বাধীনতোত্তর ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি মানুষের জীবনকে ও তার জটিল মনস্তত্ত্বকে বিংশ শতকের সাহিত্যিকগণ তিলে তিলে গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করেছেন।

গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম যা আজও মানবমনে সচল প্রবাহে বহমান। সমস্ত সাহিত্যরীতির মধ্যে কেবল গল্পের মাধ্যমে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি সর্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। তার মানে এই নয় যে অন্যান্য সাহিত্যরীতির দ্বারা তা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু অন্যান্য রীতির তুলনায় ছোটগল্প পাঠক মনে খুব দ্রুত এবং গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। ছোটগল্পের মধ্যে নিত্যকালের বস্তুময় জীবন সুসংগত ও সুগভীরতায় প্রতিফলিত হয়। আমাদের সমাজে অবস্থিত পারিপার্শ্বিক মানুষজনের দেহ, মন ও আত্মার অনায়াস রূপ বাস্তবতার সাথে প্রতিফলিত হতে পারে ছোটগল্পের মধ্যে। মানুষের মন সমুদ্রের গভীরতার ও বিস্তীর্ণ মহাকাশের মত বিস্ময় ও রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ। মানুষের গোটা জীবন পরস্পর বিরোধী প্রবণতার আঘাতে জর্জরিত। ফলে মানুষকে নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা, বিস্ময় ও রহস্যময়তার অন্ত নেই। মনুষ্য জীবনের সেই বিচিত্র রূপের সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে স্বাধীনতোত্তর ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি মানুষের জীবনকে ও তার জটিল মনস্তত্ত্বকে বিংশ শতকের সাহিত্যিকগণ তিলে তিলে গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করেছেন। ছোটগল্পের শিল্পীরা শিশির বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে তুলে ধরেছেন।[১]

ছোটগল্পের বিচিত্র বিষয় বৈচিত্রের মধ্যে অন্যতম হল মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। স্বাধীনতোত্তর বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীরা এই বিষয় নিয়ে বহু গল্প রচনা করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যে একে 'ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব' রূপে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড' (১৮৫৬ - ১৯৩৯) ছিলেন মনোবিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠাতা।এটি মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা ও আচরণের ব্যাখ্যাকারী একটি তত্ত্ব। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন- শৈশবের ঘটনাগুলি আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে যা আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। যেমন, একজন ব্যক্তির অতীতের আঘাত মূলক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত উদ্বেগচেতনা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সমস্যা (নিউরোসিস) সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিত্বের লুকানো গঠন এবং প্রক্রিয়াগুলোকে অস্পষ্ট করে এমন সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত ছদ্মবেশ ভেদ করার প্রচেষ্টা দ্বারা ফ্রয়েডের জীবনকর্ম প্রাধান্য পেয়েছিল।

Discussion

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব[২] :

মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব : এটি মানুষের অচেতন চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অন্বেষণ করে মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একটি থেরাপিউটিক কৌশল। ফ্রয়েড মনের একটি ভূ-প্রকৃতিগত মডেল তৈরি করেছিলেন যেখানে মনের গঠন এবং কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছিল। **ব্যক্তিত্ব :** ফ্রয়েড মানব মনের একটি ত্রিপক্ষীয় মডেল প্রস্তাব করেছিলেন, যা id, ego এবং superego দ্বারা গঠিত। id আদিম আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে, অহং id এবং বাস্তবতার ভারসাম্য বজায় রাখে, এবং superego সামাজিক নিয়ম এবং নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের তিনটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে আইডি, ইগো এবং সুপার ইগোকে সাধারণত ধারণা করা হয়। **মনোযৌন বিকাশ :** ফ্রয়েডের মনোযৌন বিকাশের বিতর্কিত তত্ত্ব থেকে জানা যায়, শৈশবের অভিজ্ঞতা এবং পর্যায়গুলি (মৌখিক, পায়ুপথ, ফ্যালিক, ল্যাটেন্সি এবং যৌনাঙ্গ) আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্ব এবং আচরণকে গঠন করে। তার মনোযৌন বিকাশ স্তরের তত্ত্বটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি, শৈশবের অভিজ্ঞতা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্ব তৈরি করে এবং প্রাথমিক জীবনের সমস্যাগুলি মানসিক অসুস্থতা হিসাবে ব্যক্তিকে তাড়া করে ফিরে আসে। **স্বপ্ন বিশ্লেষণ :** ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন স্বপ্ন হল অবচেতন মনের জানালা এবং অবদমিত চিন্তাভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য স্বপ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। স্বপ্নগুলি আত্মা থেকে অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা চেতনায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু যেহেতু এই ইচ্ছাগুলি প্রায়শই অগ্রহণযোগ্য, তাই প্রতীকবাদের মতো প্রতিরক্ষা ব্যবহার করে এগুলিকে ছদ্মবেশী বা সেন্সর করা হয়। **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা :** ফ্রয়েড দমন এবং অভিক্ষেপের মতো বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছিলেন, যা অহংকার আইডি, সুপারইগো এবং বাস্তবতার চাহিদার মধ্যে উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করে।[৩]

এই 'ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব'-র উপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতোত্তর বাংলা ছোটগল্পে প্রতিফলিত চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে মনের জটিল গ্রন্থি মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। দুটি অতিপরিচিত এবং বিখ্যাত ছোটগল্পকে সামনে রেখে এই আলোচনার অবতারণা। যথা - ১. সুবোধ ঘোষ রচিত 'জতুগৃহ' এবং ২. গৌরকিশোর ঘোষ রচিত 'জবানবন্দী'।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু ছোটগল্পে মনস্তত্ত্বের বহুমুখী দিকের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সম্পর্কের আড়ালে মানুষের জটিল ব্যবহার ও আচরণকে প্রকাশ করেছেন তার সৃষ্টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জৈবিক চাহিদা মানুষের জীবনে কখনও কখনও সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা বয়ে নিয়ে আসে। জীবনকে কখনও সুন্দর করে তোলে কখনও বা জটিল। ছোটখাটো মান অভিমান কীভাবে দাম্পত্য জীবনে বড় ধরনের অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে এবং তার ফলে প্রকৃত প্রেম কীভাবে ঘৃণায় পরিণত হয় এবং কীভাবে একটি দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে তারই বর্ণনা আমরা পাই সুবোধ ঘোষের কয়েকটি ছোটগল্পে। তেমনই একটি গল্প 'জতুগৃহ'। এটি একটি সুন্দর প্রেমের গল্প। সাধারণভাবে আমরা প্রেমের সার্থকতা বলতে বিবাহকেই বুঝি। লেখক এই গল্পে সেটাই দেখিয়েছেন কিন্তু এই বিবাহের সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। তাই বলে লেখক কখনোই প্রেমকে ছোটো করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেখাতে চাননি। বিচ্ছেদের পরেও প্রেমের শাশ্বত অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানেই অন্যান্য গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পকে আলাদা করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও একে অপরের হৃদয়ে প্রেম বেঁচে থাকে যা সময় ও সুযোগ পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে। এমনই একটি প্রেমের কাহিনি 'জতুগৃহ' গল্পে রয়েছে।

এই গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়েই আমরা গল্পকারের ইঙ্গিতপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাই। জতুগৃহের পরিচয় আমরা মহাভারতে পাই, যেখানে দুর্যোধন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। যদিও এই গল্পে কোনও পৌরাণিক কাহিনি নেই, না আছে মহাভারতের কোনও চরিত্র। সুবোধ ঘোষের এই গল্পে উল্লিখিত রাজপুর জংশনের প্রথম শ্রেণির প্রতীক্ষালয় যেখানে দুটি চরিত্র 'শতদল দত্ত' ও 'মাধুরী রায়' মিলিত হয়েছে, সেটাকেই 'জতুগৃহ' হিসেবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই গল্পে কাহিনির শুরু এবং শেষ ওই প্রতীক্ষালয়েই। কাহিনি যত এগিয়েছে তত এই বিলাসবহুল প্রতীক্ষালয় হয়ে উঠেছে জতুগৃহের সমতুল্য। সেখানে আগুনে পুড়ে মরার কোনও সম্ভাবনা নেই কিন্তু রয়েছে আগুনের থেকেও ভয়ংকর উত্তাপ। রয়েছে প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা বা বলতে গেলে প্রাক্তন দম্পতির একে অপরের প্রতি নির্ভেজাল ভালবাসার উত্তাপ যা দুজনকেই দগ্ধ করেছে।

গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে রাজপুর জংশনের প্রতীক্ষালয় থেকে। দুই বাঙালি যাত্রী 'শতদল দত্ত' ও 'মাধুরী রায়' এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই প্রতীক্ষালয়ে। দুজনেই শিক্ষিত আধুনিক চিন্তা ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। লেখক এইভাবে দু'জনের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন –

> "কুলির মাথায় বাক্স বেডিং চাপিয়ে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে তরতর করে হেঁটে ওয়েটিং রুমে প্রথম এসে ঢুকলেন এক বাঙালি মহিলা। গায়ে কাশ্মীরি পশমে তৈরি একটা মেয়েলি আলস্টার, কানে ইহুদি প্যাটার্নের ছোট ফিরোজার দুল, খোপা বিলিতি ধাচে ফোঁপানো।"[৪]

অপর যাত্রীর বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন –

> "তারপরেই যিনি এসে ঢুকলেন তারও সঙ্গে কুলি আর তেমনি বাক্স বিল্ডিং এর বহর। চোখে চশমা, গায়ে শাল, দেশী পরিচ্ছদে ভূষিত এক বাঙালি ভদ্রলোক।"[৫]

দুই বাঙালি যাত্রীকে লেখক এনে দাঁড় করালেন বাঙালি সমাজ, বাঙালি চিন্তা চেতনা থেকে বহুদূরে রাজপুরের ওয়েটিংরুমে। ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করেই দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে চমকে ওঠেন, তারপরে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে পুরোনো দিনের কথা। এরপরেই গল্পকার ফিরে গেছেন তাদের অতীত জীবনের দিকে। কিভাবে দুজনের পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয় প্রেমে এবং সেই প্রেম বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। সময়টা নিছক কম ছিল না দীর্ঘ সাতটা বছর দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে উভয়েই এখন নতুন জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছে। দাম্পত্য জীবনে কাটানো একে অপরের প্রতি সেই ভালোলাগার অনুভূতি হয়তো হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যায়নি। দুজনেই বর্তমানে নিজেদের দাম্পত্য সঙ্গীর সাথে সুখে জীবন কাটাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ আবার একে অপরের সঙ্গে দেখা এই নিভৃত স্থানে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে দুজনেই। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত একে অপরকে এড়িয়ে যেতে চায়। শতদলও তাই চেয়েছিল। ওয়েটিং রুমে মাধুরীকে দেখে তার প্রথম আচরণ তারই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু শতদল পারেনি। নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল মাধুরীর রূপের কাছে। নতুন রূপে, নতুন ভাবে মাধুরীকে আবিষ্কার করেছিল সেই ওয়েটিং রুমে। এত বছর পর মাধুরীকে একান্তে কাছে পেয়ে শতদলের মনের মরাগাঙ-এ ভালোবাসার জোয়ার এসেছিল। লেখকের ভাষায় - "এমন মেঘ রঙের শাড়ি তো কোনও দিন পড়েনি মাধুরী, এমন করে এত লম্বা আঁচল মাধুরীকে লুটিয়ে দিতে দেখেনি শতদল।"

অথবা—

> "মাধুরী বসে আছে এক নতুন শিল্পীর রুচি দিয়ে গড়া মূর্তির মতো, নতুন রঙে আর সাজে।"[৬]

এভাবেই শতদলের চোখে নতুন রূপে মাধুরী ধরা দিয়েছে, যা দীর্ঘ সাত বছরের দাম্পত্য জীবনের শেষের দিকে তার চোখে পড়েনি। হয়তো শত দল সেভাবে মাধুরীকে দেখার চেষ্টাই করেনি। সংসারের নিত্যদিনের চাপে কতটুকুই বা সময় পাওয়া যায় স্ত্রীর দিকে এমনভাবে খুটিয়ে দেখার? গল্পকার জানিয়েছেন শুধুমাত্র শতদল মাধুরীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু নয়। সময় যত গড়িয়েছে মাধুরীও আসতে আসতে মনের জড়তা কাটিয়ে স্মৃতির কঠোর থেকে শতদলকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে, মনে মনে ভেবেছেন এই মানুষটির প্রতিই এক সময়ে তাঁর ভালোবাসা জন্মেছিল। এখন পরিস্থিতির কারণে হতে পারে শতদল পরপুরুষ কিন্তু গত পাঁচবছর ছিল তারই দাম্পত্যসঙ্গী। সেই সময়ের ভালোবাসা যে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে তা মেনে নেওয়া একটু কঠিন। তাই হয়তো লেখক মাধুরীর মনের সেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। লেখক বলেছেন –

> "শতদলের দিকে তাকিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন ছিল না মাধুরীর। সে তাকিয়ে ছিল আয়নায় প্রতিবিম্বিত শতদলের দিকে। ইচ্ছে করে নয়, আয়নাতে শত দলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তাই এবং ইচ্ছে না থাকলেও লুকিয়ে দেখার এই লোভটুকু সামলাতে পারেনি মাধুরী।"[৭]

গল্প যত এগিয়েছে দুই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ততটাই প্রকাশিত হয়েছে। দুজনেই এই অদ্ভুত পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার প্রয়াস করেছে। ওয়েটিং রুমে তাদের ব্যবহার দেখে মনে হয়না যে দীর্ঘ সাত বছর পর তাদের দেখা হয়েছে, মনে হয় যেন তারা এখনো পরস্পরের দাম্পত্য সঙ্গী। পরস্পর পরস্পরের ছোটখাটো আচরণগুলি এখনো তাদের স্পষ্ট ভাবে মনে রয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মাধুরীর চা তৈরি করার কৌশল শতদল মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে, খুঁজে পেয়েছে পুরনো মাধুরীকে। চা খাওয়ার আছিলায় দুজনে আরো কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে। শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই তৃপ্তি অনুভব করেছে। লেখক জানিয়েছেন– "চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে শতদল। শুধু চায়ের আস্বাদ পেয়ে নিশ্চয়ই নয়। চায়ের সঙ্গে মাধুরীর হাতের স্পর্শ মিশেছে তৃষ্ণা মিটে যাওয়ারই কথা।"

সাত বছরের এই যে দীর্ঘ সময়, এই সময়ের ব্যবধান নিমেষে মুছে ফেলে শতদল। মাধুরীর হাত নিজের হাতে নিয়ে নেয়। মাধুরী তাতে আপত্তি করে না। এ যেন তাদের বাসরঘর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দুজনেই যেন চিরকালের সংসারের সহযাত্রী। কোনও দিন তাদের বিচ্ছেদ হয়নি। সাত বছরের পলাতক মায়াকে অনেক সন্ধানের পর এতদিনে কাছে পেয়েছে। দু-হাতে জোর করে চেপে রেখেছে যেন হাত দুটো আবার হারিয়ে না যায়। দু-জনের কথোপকথনে উঠে আসে অন্তরের গভীরে থাকা শাশ্বত ভালোবাসার কথা, যা কখনো শেষ হয় না, হতে পারে না।

শতদল মাধুরীকে প্রশ্ন করে -

> — "তুমি বিশ্বাস করো মাধুরী?"
> — কী?
> — "তোমাকে আমি ভুলিনি, ভুলতে পারা যায় না।"
> — "বিশ্বাস না করার কি আছে? চোখেই দেখতে পাচ্ছি।"
> — কিন্তু তুমি?
> — কী?
> — "তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে?"[৮]

মাধুরী এখনও শতদলকে ভুলতে পারেনি। এই কথাটা মাধুরী মুখে বলতে চায়না ঠিকই, কিন্তু তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি তার আচরণে। এই সংলাপ চলাকালীন মাধুরী যেন নিজেকে সমর্পণ করে দেয় শতদলের কাছে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস বশত মাথাটা শতদলের বুকের কাছে একটু ঝুঁকে পড়ে। দু-চোখের কোণে ছোট ছোট জলের বিন্দু জেগে ওঠে। মাধুরীর মনের অবস্থা বুঝতে পাঠকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। মুহূর্তের জন্য যেন সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে শতদলের কাছে সমর্পণ করেছে নিজেকে। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবের জগত, বর্তমান জীবন মাধুরীকে টেনে নিয়ে যায় বাস্তবতার রূঢ় মাটিতে। তার মনে পড়ে যায় বর্তমান স্বামীর কথা। কিছু মুহূর্ত পরেই রাজপুরের সেই জংশনে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। একটা ট্রেন এসে থামে স্টেশনে। ওয়েটিং রুমে এসে উপস্থিত হয় মাধুরীর স্বামী অনাদি রায়। জীবনের সমস্ত হিসেব-নিকেশ যেন ওলট-পালট হয়ে যায় দুজনের। অনাদি রায় এসে মাধুরীকে স্নেহের পরশ দেয়। চোখের সামনে শতদলকে দেখতে হয় একটা প্রহসনের দৃশ্য, এক নির্মম ও অশোভন দৃশ্য। সহ্য করতে কষ্ট হয় তবুও সহ্য করে নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। চলে যেতেই পারতো শতদল। কিন্তু যায় না, অপেক্ষা করতে থাকে একটি উত্তর পাওয়ার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্য। "মাধুরী কি তাকে ভুলতে পেরেছে?" এই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে দীর্ঘ সাত বছরের বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্ত বেদনা নিরাময় ঔষধ। উত্তরটা যদি সদর্থক হয় তাহলে আলাদা একটা মানসিক শান্তি নিয়ে বাসায় ফিরতে পারবে শতদল। বর্তমান স্ত্রীর সাথে সুখে নেই এমনটা কিন্তু নয়। তবুও প্রাক্তনীর হৃদয়ে নিজের প্রতি এখনও ভালোবাসা রয়েছে এটা জানতে পারার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে। এ এক জটিল মনস্তত্ত্ব বিষয় যা সুবোধ ঘোষ শতদল চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রেমমনস্তত্ত্বের এ এক উচ্চপর্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু শতদল এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পায় না। হয়তো এই সাত বছরে মাধুরী শতদলকে ভুলে গেছে বা ভুলে থাকার অভিনয় করে গেছে। বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে মাধুরী। পরিস্থিতির কাছে শতদলের প্রতি নিজের ভালোবাসাকে, অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এখন তার কাছে অনাদি রায় সবকিছু। শতদল অতীত মাত্র। মাধুরী স্বামীর সঙ্গে সেই ওয়েটিং রুম থেকে বিদায় নেয়। বিদায় নেওয়ার আগে শতদলের মনের জতুগৃহে এক অদৃশ্য আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এভাবে ক্ষণিকের জন্য শতদলের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে সরে যাওয়াকে শতদলের তামাশা বলে মনে হয়। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে মাধুরীকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতকে গ্রহণ করা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবেগের বশবর্তী হয়ে শতদল হয়তো ক্ষণিকের জন্য নিজের বর্তমানকে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু মাধুরী ভোলেনি। হতে পারে পুরাতন প্রেম কখনো কখনো ফিরে আসার সুযোগ খুঁজে পায়। তাই বলে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা গ্রহণ করাটা এক প্রকার অপরাধ। এই অপরাধবোধ থেকেই মাধুরী অতীতকে প্রশ্রয় দেয়নি। আসলে প্রেম সব সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে করাটা উচিত নয়। কখনো কখনো নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করা উচিত। মাধুরী চরিত্রের মধ্যদিয়ে গল্পকার সুবোধ ঘোষ এই সাধারন সত্যকে পাঠকের সামনে সুন্দরভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

'জবানবন্দী' গল্পের মধ্যে দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতির থেকেও বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিজীবনের সমস্যা। গল্পকার এখানে সমগ্র মানুষের সমস্যার কথা না বলে, ব্যক্তি মানুষের সমস্যাকে বেশি করে দেখিয়েছেন। গল্পে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যদিয়ে ব্যক্তি মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। এই গল্পে লেখক ত্রিকোণ প্রেমের জটিল কাহিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে অবৈধ প্রেমের টানে পালিয়ে যাওয়া এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তাদের জবানবন্দী নেওয়ার কথা রয়েছে এই গল্পে। স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যখন তৃতীয় পুরুষের আগমন ঘটে তখন দাম্পত্য জীবন কতটা দুর্বিসহ ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে তার চিত্র পাই এই গল্পে। স্বামী স্ত্রী এবং স্ত্রীর অবৈধ প্রেমিক এই তিনজনের জবানবন্দী এখানে মূল বিষয়। দারোগাবাবু প্রত্যেকের কাছে জবানবন্দী নিয়েছেন। তিনজনই নিজেদের কাহিনি ব্যক্ত করেছে। প্রত্যেকের কাহিনির মধ্যেই রয়েছে বেদনা, যন্ত্রণা, ভালোবাসা এবং মানসিক টানাপোড়েন। এই গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনসংকট, দেশভাগের যন্ত্রণা, এসবকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে পিতৃত্ব, সন্তানস্নেহ, ব্যক্তিপ্রেম, এবং প্রেমিকসত্তা।

গল্পে রয়েছে তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্র ভবেশরঞ্জন মজুমদার, মেনকা চক্রবর্তী এবং তৃতীয় ব্যক্তি সুশীলকুমার মিত্র। ভবেশবাবু পাটনার কোনও এক কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপ। বয়স তার পঞ্চান্ন বছর। তিরিশ বছর আগে প্রথম বিবাহ করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে স্ত্রী মারা যান। তারপর থেকে আর বিবাহের পথে হাঁটেননি। দু বছর আগে মেনকাকে বিবাহ করেছেন। একটা কন্যা সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই তার স্ত্রীর জীবনে প্রবেশ করে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ সুশীলকুমার মিত্র। এই সুশীলের সঙ্গে মেনকা গোছানো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সুশীলের হাত ধরে পাটনা থেকে পালিয়ে আসে কলকাতায় নতুন জীবনের সন্ধানে। ঘটনাচক্রে ভবেশবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে জি.আর.পি-এর হাতে ধরা পড়ে যায়। দারোগাবাবু এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এই তিনজনের মুখে জবানবন্দী আকারে শুনতে চেয়েছেন। যেহেতু অভিযোগকারী ভবেশরঞ্জন মজুমদার সুতরাং তার থেকেই প্রথম সম্পূর্ণ ঘটনা জানতে চাওয়া হয়। ভবেশবাবু নিজের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত ঘটনা বিশদে বর্ণনা করতে থাকেন। কীভাবে তার মেনকার সাথে পরিচয় হয়েছিল, কীভাবে তার সমস্ত সংসারের দায়িত্ব সে পেয়েছিল, এই সমস্ত কথা ভবেশবাবু জবানবন্দীর আকারে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "চার বছর আগে মেনকা আমার বাড়িতে আসে। কলেজের এক সহকর্মী ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে আনেন। মেয়েটি নিরাশ্রয়, পাকিস্তান দেশ। নানা আশ্রয় শিবিরে ঘুরে পাটনায় উপস্থিত হয়েছে। একটি নিরাপদ আশ্রয় ওর চায়।"[৯]

ভবেশবাবু আরও জানায়, তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একাই থাকতেন। একটা চাকর রয়েছে সেই দেখাশোনা করে। মেনকার যদি সমস্যা না থাকে তাহলে সে অনায়াসে থাকতে পারে। আসলে মেনকা দেশভাগের ফলে তৈরি নারকীয় পরিবেশ থেকে ফিরে এসেছিল। অধিকাংশ উদ্বাস্তু মেয়েদের মেনকার মতই অবস্থা ছিল। মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই পেলেই হয়তো সেটাকেই স্বর্গপ্রাপ্তি মনে করতো। এমন অবস্থায় মেনকা উপস্থিত হয়েছিল ভবেশবাবুর বাড়িতে। এই প্রথম মেনকা এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিল যাকে সে বিশ্বাস করতে পারতো। ভবেশবাবুর সহানুভূতি এবং কোমল আচরণ পেয়ে মেনকার এতদিনের জমানো দুঃখ অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ভবেশবাবু মেনকাকে শুধু আশ্রয় দেননি, ধীরে ধীরে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব মেনকার হাতে তুলে দিয়েছিল। ভবেশবাবু দারোগাকে জানিয়েছিলেন –

> "মেনকা আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, যদি এ কথা বলি তাহলে ভুল বলা হয়। আমাকেই ও আশ্রয় দিয়েছিল। এত সেবা, এত যত্ন, আমি আর কারো কাছে পাইনি। শুকনো অংক আর শাস্ত্রের নানা জটিল ফর্মুলা, এই নিয়ে ভরেছিল আমার জীবন। তার রস গিয়েছিল শুকিয়ে।"[১০]

ভবেশবাবু আরও বলেছেন – মেনকাকে পেয়ে যেন তার পলাতকা যৌবন ফিরে পেয়েছিল। কাজ করার ক্ষমতা যেন পুনরায় ফিরে পেয়েছিল। কাজ শেষে নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসতেন তখন মেনকা অসীম ধৈর্যে তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতো। মেনকাকে দেখে তার সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যেত। সে যেন সমস্ত সংসারকে এক কোমল উষ্ণতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। মেনকার এই ব্যবহারে ভবেশবাবু তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। স্বামী, সংসার, সন্তান সবকিছু মেনকাকে দিয়েছিলেন কিন্তু তবুও সেই গোছানো সংসার ছেড়ে গুপ্ত প্রেমিকের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল। এই ঘটনায় মেনকাকে যতটা না দায়ী করেছেন, তার থেকে বেশি দায়ী করেছেন সুশীলকে। ভবেশবাবুর কথায়– "ওই হতভাগাটা এসে গোলমাল পাকাতো। মেনকা বিগড়েছে ওর ফুসলানিতে। ওর প্ররোচনায় ঘর ছেড়েছে।" কিন্তু আসল ঘটনা কী ঘটেছিল, তার পরিচয় আমরা পাই সুশীল এবং মেনকার জবানবন্দী থেকে। এ ঘটনার জন্য সুশীলকে কতটা দায়ী করা যায়? মেনকা কতটা নির্দোষ? তা ক্রমশ প্রকাশিত হয় দুজনের স্বীকারোক্তিতে। ভবেশবাবু যখন নিজের জবানবন্দী দিচ্ছিলেন তখন পাশে বসে তারা মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম দিকে ভবেশবাবুর উপর মেনকা প্রচন্ড রেগে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল ভবেশবাবু তার জন্য কতকিছু করেছিল। উদ্বাস্তু জীবন থেকে সংসার দিয়েছিল, মান সম্মান, স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিল। এখন ভবেশবাবুর কথাগুলো শুনে তার প্রতি একটু সহানুভূতির ভাব জেগে উঠেছিল। সুশীলের মনের মধ্যেও একপ্রকার দয়ার ভাব উদয় হয়েছিল। মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়েছিল যে, সত্যি কথাটা বলবে না। মিথ্যে জবানবন্দী দিয়ে ভবেশবাবুকে সন্তান ও সন্তানের জননীকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু পর মুহূর্তে মেনকাকে হারানোর ভয় তাকে সচেতন করে দিয়েছে। সে কোনও ভাবেই মেনকাকে হারাতে দিতে চায় না। নিজের অধিকার কোনও ভাবেই বিসর্জন দিতে পারবে না। ভালো মানুষ হয়ে তার কোন লাভ নেই। সে মেনকাকে পেতে চায়। মেনকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে চায়। সেই জন্যই তারা পাটনা ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। এখানে তারা নিয়ম মেনে, শাস্ত্রমতে বিয়ে করে নতুন সংসার পাততে চায়। সে মেনকাকে পালিয়ে নিয়ে আনেনি। দুজনের সম্মতিতে তারা এসেছে।

সুশীলের জবানবন্দী থেকে আমরা জানতে পারি ভবেশবাবুর কন্যা খুকু আসলে সুশীলের সন্তান। কথাটা শোনার পরে ভবেশবাবু যেন আকাশ থেকে পড়েন। কোনও ভাবেই সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সুশীলের কথা সত্যি হয়। মুহূর্তের জন্য ভবেশবাবুর পায়ের মাটি সরে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সুশীলের কথা মন দিয়ে শুনতে থাকে। সন্তানের দাবি সুশীল কখনো জানায়নি, জানিয়েছে মেনকার দাবি। পিতৃসত্তা থেকে প্রেমিকসত্তা সুশীলের মধ্যে বড়ো করে দেখা দিয়েছে। মেনকার সংস্পর্শে এসে সুশীলের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে সেটা জবানবন্দীতে জানিয়েছে। সে বলেছে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মেনকাকে যতবার জড়িয়ে ধরেছে ততবারই সে অনুভব করেছে যে, তার ত্বকের কোষে কোষে রক্তের কনায় কনায় বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সমগ্র দেহে যেন ভাঙ্গাগড়ার খেলা শুরু হয়েছে ভয়াবহ বেগে। প্রতিমুহূর্তে মরে, প্রতি মুহূর্তে বেঁচে সে অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই প্রতিক্রিয়াকে কী বলবে সুশীল? তার ধারণা, এই হল প্রেম। জীবনকে প্রত্যহই এলোমেলো করে দিয়ে আবার সুন্দর সামঞ্জসে যা তাকে সাজিয়ে রাখে তাই প্রেম। আর মেনকায় তাকে সে প্রেম দিতে পেরেছে। দিয়েছে দেহ মন উজাড় করে। ফাঁকা রাখেনি। ফাঁক রাখেনি কোথাও।"[১১]

সুশীলের এই স্বীকারোক্তি শুনে সত্যিই প্রেমের এক অপরূপ অনুভূতি পাঠকের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শাশ্বত প্রেমের অনুভূতি হয়তো এমনই যা মেনকা সুশীলকে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে বা ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে অথবা সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করলে এদের প্রেমকে অবৈধ আখ্যা দিতেই হয়। যেখানে মনের অনুভূতির থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বড়। মেনকা ও সুশীল সেই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত টানে নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেটাই তাদের দোষ। যেমন ভাবে প্রবল স্রোত বিভ্রান্ত নাবিকের জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে নামহীন কোনো বন্দরে ভিড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনই হয়েছিল সুশীল ও মেনকার জীবনে।

সবশেষে মেনকার জবানবন্দী শোনার পালা। যে অপ্রীতিকর ঘটনা এই তিনজনের জীবনে ঘটে চলেছে, তার জন্য একক ভাবে কাউকে দায়ী করা চলে না। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনই একার ইচ্ছায় কখনও প্রেম হয় না। একার ইচ্ছায় কখনও কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় না। এই পরিস্থিতির জন্য মেনকা কতখানি দায়ী তার পরিচয় আমরা পাই তার জবানবন্দীতে। মেনকা জানায়, সে সুখে শান্তিতে ভবেশবাবুর সাথে সংসার করছিলেন। মেনকা বুঝতে পারত, অন্য কেউ হয়তো নিজের স্ত্রীকে এত সম্মান, এত ভালোবাসা দেয় না যতটা ভবেশবাবু তাকে দেয়। মেনকা প্রতিদিন চেষ্টা করত স্বামীকে তুষ্ট করতে। সব রকমের সুখ দিতে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভবেশবাবুর আচরণে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখা যায়। খুঁতখুঁতে হয়ে ওঠেন। এত পেয়েও যেন সে অতৃপ্ত। মেনকা তাকে সমস্ত রকম সুখ দিলেও সন্তান সুখ দিতে ব্যর্থ। মেনকা বলেছে – "সন্তানের ক্ষুধা দিনের পর দিন ওকে গ্রাস করে ফেলল। ওর সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসলো। সেই সঙ্গে আমারও। অনেক রকম চেষ্টা করে দেখলাম। শেষে বুঝতে পারলাম ওঁর ক্ষমতায় সন্তান আমার কোনও দিনই হবে না। আবার এও ঠিক সন্তান একটা না দিলে ওর মনে শান্তি আসবে না।" ঠিক এমন পরিস্থিতির মধ্যে পরিচয় হয়েছিল সুশীলের সাথে। ভবেশবাবু সুশীলকে তাদের বাড়িতে এনেছিলেন সহকারী হিসেবে। দুজনে প্রাণপণে গবেষণা করতেন। তারপর আস্তে আস্তে সুশীলের সাথে মেনকার পরিচয় গভীর হতে থাকে। সেই পরিচয় সুন্দর সম্পর্কে পরিনত হতে বেশিদিন সময় নিল না। তিনজনের হাসি ঠাট্টাতে ভরে উঠেছিল তাদের জীবন। কিন্তু প্রতি রাত্রে মেনকা টের পেতো ভবেশবাবু কতটা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মেনকার অনুভূতি লেখকের ভাষায় এভাবে প্রকাশিত হয়েছে –

> "প্রতি রাত্রে টের পেতাম কি তীব্র এক আকাঙ্ক্ষা, কি অসহনীয় এক অতৃপ্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন উনি। ওর বুকটা যেন শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে পর্যন্ত সন্তানের কামনা ঝরে ঝরে পড়ছে।"[১২]

মেনকা উপলব্ধি করতে পারতেন ভবেশবাবুর যন্ত্রণার কথা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন, যেকোনও উপায়ে যেন একটি সন্তান তাকে উপহার দেওয়া যায়। এমন সময় মনে পড়ে সুশীলের কথা। ভবেশবাবুকে সন্তান সুখ দেওয়ার জন্য নিজের দেহকে সুশীলের কাছে সমর্পণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। মেনকা এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে এতদিন পর নিজের দেহটাকে পবিত্র কাজে লাগিয়েছে। ভবেশবাবুর সন্তান কামনা পূর্ণ করা যেন তার জন্মের ঋণ শোধ করা। কিন্তু কিছুদিন পরে সে বুঝতে পারে যে হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। সুশীল শুধুমাত্র তার গর্ভে সন্তান দেয়নি, তার মনেও তীব্র প্রেমের জন্ম দিয়েছে। সে বুঝতে পারে এক নতুন যন্ত্রণার কথা, অপরিচিত এক স্বাদ, মাধুর্যভরা এক ভালোবাসা যা সুশীলকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে। বহুদিন এ যন্ত্রনা সে সহ্য করেছে। প্রাণপণে চেয়েছিল ভবেশবাবুর সংসার আঁকড়ে ধরতে, কিন্তু পারেনি। উপেক্ষা করতে পারেনি সুশীলের দাবি। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছিল তার কাছে। সাংসারিক দায় দায়িত্ব কর্তব্য সমস্ত কিছু প্রেমের কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। সেই জন্যই সে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 187 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংসার ত্যাগ করে প্রেমিক বা প্রেমিকার হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্তমান সমাজে আমরা সচরাচর পেয়ে থাকি। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা এখন অগণিত। কেউ বা পরিস্থিতির চাপে পড়ে, কেউ বা কামনার বশবর্তী হয়ে ভুল পথে চালিত হয়। সমাজের এ এক অবক্ষয়ের যুগ যার সূচনা স্বাধীনতাপরবর্তী সময় বা তারও আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। গল্পকার গৌরকিশোর ঘোষ একজন সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে সেই সমস্যাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

উপসংহার : আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে প্রথম রিপুর সর্বগ্রাসী প্রভাব। যার ফলে ব্যক্তিগত বা দাম্পত্য সম্পর্কে অবনমন দেখা দিয়েছে। মানুষের অবচেতন মন থেকে এই আদিম প্রবৃত্তির জন্ম নেয় এবং চেতন মনকে গ্রাস করে শুভ অশুভ জ্ঞান বিলুপ্ত করে ফেলে। আধুনিক জীবনযাপন পদ্ধতি এই প্রবণতাকে আরও ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। সমাজের এই সমস্যাকে স্বাধীনতোত্তর সাহিত্যিকগণ নিজ সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

Reference:

১. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭-২০১৮, পৃ. ৩
২. ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, মনোবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ ২০২২, পৃ. ১৭২
৩. তদেব, পৃ. ৪২৮
৪. ঘোষ, সুবোধ, জতুগৃহ গল্প সংকলন, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, কলিকাতা- ২৫, পৃ. ২
৫. তদেব, পৃ. ২
৬. তদেব, পৃ. ৮
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ১৮
৯. ঘোষ, গৌরকিশোর, মন মানে না গল্প সংকলন, ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা- ১২, পৃ. ১৩৩
১০. তদেব, পৃ. ১৩৬
১১. তদেব, পৃ. ১৪১
১২. তদেব, পৃ. ১৫০